যাঁদের নিয়ে এই শহর

কলকাতা সকলের শহর। নানা জাতি, নানা সম্প্রদায়ের মানুষ এ মহানগরকে আপন করে নিয়েছেন। যেমন, পার্সি, আর্মেনীয়, চিনা, ইহুদি, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। তাঁদের নিয়ে একটি সমীক্ষা।

● কলকাতায় চিনা উৎসবের একটি দৃশ্য।
ছবি: তারাপদ ব্যানার্জি

াতার অতীত ও বর্তমান নিয়ে এই যে পুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে ধ্য আড়ালে পড়ে গেছেন এ শহরের ার অঙ্গাঙ্গী অংশ কতগুলি ছোট ছোট য়ের মানুষেরা। এ শহরের দৈনন্দিন াায় তাঁদের সম্পৃক্তি বা বিচ্ছিন্নতা, লকাতা সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব কোন হয়েছে, এ শহরের বর্ণময় বৈচিত্র্যের বা এঁদের অবদান, তা আলোচনার ই এ লেখার অবতারণা।

সমীক্ষা করেছি পাঁচটি ছোট কে—পার্সি, আর্মেনীয়, চিনা, ইহুদি ও -ইন্ডিয়ানদের। শুধু অ-হিন্দু বলেই বাছা হয়নি। আবার শুধু সংখ্যার ও নয়। এই পাঁচ সম্প্রদায়ের প্রতিটিই র বাইরে থেকে এসেছেন, একথা কোনও লা চলে না, কারণ বাঙালিদের মতো -ইন্ডিয়ানরাও কলকাতার 'সন অফদি । সকলে পশ্চিমের দেশগুলি থেকে তায় এসেছেন এমনও নয়। আবার উপনিবেশে সকলে এসেছেন, একথা বলা না ; আর্মেনীয়রা এসেছিলেন ব্রিটিশদের আর অধিকাংশ চিনা এসেছেন অতি ।

ই হবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান হিসেবে কলকাতার যে বাড়বাড়ন্ত, সেই র আকর্ষণে, তাতে ভাগ বসাতেই এঁদের বেশির ভাগ কলকাতায় এসেছিলেন। ক আবার হয়তো অন্যত্র চলে গেছেন, অনেকেই থেকে গেছেন—আত্মীয়বন্ধুদের পুরনো সঞ্চিত বিত্তের ভরসায়, উপার্জনের পথ খুঁজে নিয়ে, অথবা জীর্ণ-শীর্ণ হতদরিদ্র া বছরের এই কলকাতা শহরের মায়ায়।

 এই পাঁচটি সম্প্রদায়ের কোনও সাধারণ খুঁজে পাচ্ছি না কিছুতেই। বরং বলা বাঙালিপ্রধান কলকাতা শহরে এই পাঁচটি য় আলাদা করে চোখে পড়েন তাঁদের ভাষা, পশ্চিমি পোশাক এবং জীবনযাত্রার ধরনের জন্য। অর্থাৎ এই পাঁচটি য়ই ইংরেজিঘেঁষা, ইংরেজিতেই ভাল য় 'অ্যাংলো-ফিলিক!' এমনকি এই র মানুষ চিনারাও গত ক'দশকে ায়ভাবে ইংরেজি ভাষা, পোশাক এমনকি ন ধর্মকে আপন করে নিয়েছেন। পার্সিদের লিসাইজেশন' তো আজ সুবিদিত।

এই পাঁচসম্প্রদায়ের অনেকেই আলাদা দাভাবে কট্টরভাবে নিজেদের ধর্ম ও তিকে আঁকড়ে আছেন। অতীতের প্রাধান্য ন পড়ে রয়েছে এঁদের অনেকেরই। তবুও জীবনযাত্রা কলকাতার সাধারণ মানুষের জাগায়।

 আমলের গোড়ার দিকে যখন এ শহর কার্যত দু'রকমের—দক্ষিণের 'সাদা' অর্থাৎ অধ্যুষিত, আর উত্তরের 'নেটিভ' অর্থাৎ য় কালা আদমিদের কলকাতা—তখন এই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরাই কমবেশি দখল ন দুই কলকাতার ঠিক মাঝখানের টুকু। মধ্য কলকাতা ও তার আশপাশের কার এই কসমোপলিটান চেহারা আজও রয়েছে। ট্যাংরা অঞ্চলের শস্তা জমি কালে চিনাদের চামড়ার ব্যবসা বাড়াতে য় করেছিল ; আজ সে সব এলাকাই হয়ে ছে দুর্ভেদ্য দুর্গবিশেষ।

কাতার মূল মূল জীবনধারার সঙ্গে এই পাঁচ দায়ের মানুষেরা কতখানি মিশে বা দূরত্ব য় রেখে চলছেন এবং কলকাতা সম্পর্কে র অনুভূতি ও সচেতনতা কতখানি—এ জানাই এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য।

 জন্য তৈরি করেছিলাম কয়েকটি প্রশ্ন : াতনিরীহ, এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে রও কিন্তু তার মধ্যে থেকে উত্তরদাতাদের র ভাবটি পরিষ্কার বোঝা যাবে। পুরো মালা এখানে আর তুলে ধরছি না, শুধু মাদের প্রয়োজনের অংশটুকু নিয়েই মাথা াচ্ছি।

ট আড়াই শ জনের উত্তর যাচাই করেছি এই ীক্ষায়। সাকলাত হল বা পার্সি ক্লাবের পার্সি প্রদায় সাদর অভ্যর্থনা করেছেন, আবার রা বা বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের চিনা পরিবার ন্দেহের বশে মুখ যে বুজেছেন তা আর লাতে পারিনি।

াট উত্তরদাতাদের মধ্যে পার্সিদের সংখ্যা কিছু শি, পঁচানব্বই জন। শহরের জনসংখ্যাতেও দের ওজন তুলনামূলকভাবে বেশি। বাকিদের ধ্যে আর্মেনীয় পঁয়তাল্লিশ জন, ্যাংলো-ইন্ডিয়ান চল্লিশ, ইহুদি পঁয়তাল্লিশ, এবং না মাত্র পঁয়ত্রিশ।

হুদিদের মধ্যে আঠেরো বছরের নীচে ছিলেন তকরা মাত্র বারো ভাগ ; ছত্রিশ থেকে নষাটের মধ্যে এবং ষাটের ওপরে আরও াল্লিশ ভাগ করে। মধ্যের আঠেরো থেকে য়ত্রিশ বছরের গোষ্ঠীতে একজনও না, হয়তো ই বয়েসের অনেকেই কলকাতা ছেড়ে বিদেশে াড়ি দিয়েছেন বলে।

কজনের মুখেও শুনি নি তাঁর মাতৃভাষা হিব্রু ; ং প্রত্যেকেই ইংরেজিকে মাতৃভাষা মনে রেন। তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে শতকরা তেত্রিশ াগ বাড়িতে হিন্দিতে কথা বলেন, বাকিরা ংশ ইংরেজিতে। কর্মক্ষেত্রে শুধু ইংরেজি ব্যবহার করেন মাত্র বাইশ শতাংশে ; ইংরেজি ও হিন্দি দুয়েতেই কথা বলেন সাতষট্টি ভাগ ; আর মাত্র এগারো শতাংশ বলেন বাংলায়। সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রেও ভাষা ব্যবহারের ধরণ প্রায় একই।

শতকরা চুয়াল্লিশ ভাগ ইহুদি উত্তরদাতা ব্যবসায়ে রয়েছেন ; আরও তেত্রিশ ভাগ চাকরিতে নিযুক্ত। অবসর নিয়েছেন এমন লোকের সংখ্যাও কম নয়। মোট উত্তরদাতার শতকরা বাইশ ভাগ অবিবাহিত বা বর্তমানে একা রয়েছেন। যাঁরা বিয়ে করেছেন তাঁদের সাতষট্টি ভাগ নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবাহিত। প্রায় ছাপান্ন শতাংশ স্কুলের পড়া শেষ করেছেন, কিন্তু গ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পর্যন্ত পড়েছেন মাত্র বাইশ ভাগ করে। শতকরা তেত্রিশ ভাগের আয় মাসে পাঁচহাজার টাকার ওপরে ; আবার মাসে এক হাজারেরও কম আয় করেন আরও তেত্রিশ ভাগ। বাকিরা পড়েন চার থেকে পাঁচ হাজার মাসিক আয়ের দলে। এখানে বলে রাখি—পাঁচ হাজারের ওপরে কারুর কারুর মাসিক আয়ের অংক কুড়ি-তিরিশ হাজার পর্যন্তও পৌঁছেছে। পুরুষদের মধ্যে একাত্তর ভাগ রোজগার করছেন ; তবে মহিলাদের মধ্যে মাত্র তেত্রিশ ভাগ রোজগারে।

ইহুদি উত্তরদাতাদের মধ্যে নিজেদের ধর্মের প্রতি গভীর বিশ্বস্ততা লক্ষ করলাম। উনআশি শতাংশ যুক্ত আছেন শহরের সিনাগগ দুটির কোনও না কোনওটির সঙ্গে।

উত্তরদাতাদের আটাত্তর ভাগই এক পুরুষেরও বেশি কলকাতায় আছেন। নিজের দেশ হিসেবে ইজরায়েলকে চিহ্নিত করেননি একজনও এবং সেখানকার সঙ্গে এঁরা তেমন কোনও সম্পর্কও রাখেন না। জোসেফ, একজন ধর্মান্তরিত ইহুদি, জানালেন তিনি ইজরায়েলে গেছিলেন কিন্তু স্ত্রী-পুত্রকে সেখানে রেখেই চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর বাঙালি-শরীরে সেখানকার তীব্র জলবায়ু সয়নি। জোসেফের নিজের ভাষায় 'দ্যাট কোল্ড এন্টারড মাই বোনস্'!

আর্মেনীয় ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য রয়েছে ফিলানথ্রপিক কলেজ, কলকাতার ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে। এখানে লেখাপড়ার জন্য দূর দূর দেশ থেকে অজস্র ছেলেমেয়ে এ শহরে এসেছেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে তাই আঠেরো থেকে পঁয়ত্রিশের গোষ্ঠীই প্রধান—শতকরা পঁয়তাল্লিশ জন। মোট সমীক্ষিত মানুষের মধ্যে ষাটের ওপরেও ছিলেন শতকরা চৌত্রিশ জন—যাঁদের বেশির ভাগই কলকাতার পুরনো বাসিন্দা।

উত্তরদাতাদের মধ্যে শতকরা উননব্বই ভাগের মাতৃভাষা আর্মেনীয়, বাকিদের ইংরেজি। বাড়ির বাইরে তাঁরা কথা বলেন প্রধানত ইংরেজি (৫৬%) অথবা বাংলায় (২৩%), কিংবা ইংরেজি, বাংলা ও হিন্দি তিন ভাষাতেই। নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের প্রধান ভাষা অবশ্যই আর্মেনীয়। আর্মেনীয়দের এক-তৃতীয়াংশ করে রয়েছেন চাকরি ও ব্যবসায়ে, এবং বাকিদের মধ্যে রয়েছে ছাত্রছাত্রী বা অবসরপ্রাপ্তেরা। মহিলারা সাধারণত রোজগেরে নন—তা সে যে-বয়েসেরই হোন না কেন। আয়ের অঙ্কগুলোও বেশ উঁচুর দিকে ; কেবলমাত্র এগারো শতাংশ মাসে এক হাজারেরও কম রোজগার করেন, বাকিদের মধ্যে বেশির ভাগই মাসে চার হাজারের ওপরে।

মোট উত্তরদাতার ছাপান্ন শতাংশ অবিবাহিত—সাধারণত অল্পবয়েসী ছেলেমেয়েরা—বাকিদের মধ্যে শতকরা পঁচাত্তর ভাগই নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ে করেছেন। বড়দের মধ্যে স্কুল তো বটেই, কলেজের লেখাপড়া শেষ করেছেন অনেকেই—সুতরাং শিক্ষাদীক্ষার সাধারণ মান বেশ উঁচু বলা চলে।

ধর্মের দিক থেকে আর্মেনীয়রা বেশ গোঁড়া ; মোট উত্তরদাতাদের সাতষট্টি শতাংশ নিয়মিত গির্জায় যান। কলকাতার আর্মেনীয় চার্চের বয়েস প্রায় শহরের সমান, তবুও এর রক্ষণাবেক্ষণের বন্দোবস্ত মন্দ নয়। চার্চ-স্কুল-কলেজের পরিচালনায় রয়েছেন সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় লোকেরা, আর এগুলি অত্যন্ত সুসংগঠিত।

শতকরা বাহান্ন জন কলকাতার সঙ্গে পরিচিত এক পুরুষেরও বেশি কাল ধরে, বাকিরা এখানে এসেছেন পড়াশুনো করতে ইরান-ইরাক প্রভৃতি দেশ থেকে। এঁরা পড়াশুনোর শেষে ফিরে যাবেন নিজের দেশে, ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তি এরকমই। আর্মেনীয়দের ছাপান্ন শতাংশই তাঁদের মূল দেশের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখেন না। [illegible]ও মাঝে মাঝে বেড়ানো বা বন্ধু-আত্মীয়ের সঙ্গে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান-এর স্তরেই মাতৃভূমির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। যদিও আর্মেনীয়ার ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কথা বলতে গিয়ে এখনও অনেকের চোখে জল আসে, তবুও আটাত্তর শতাংশই জানান যে কলকাতা শহরে তাঁরা যথেষ্ট স্বচ্ছন্দ মনে করেন নিজেদের।

এখানে সমীক্ষিত পাঁচটি সম্প্রদায়ের মধ্যে চিনাদের নিয়ে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হয়েছে। প্রথমে তো মুখ খুলতেই চাননা অনেকে ; জবাবগুলোর মধ্যেও আন্তরিকতার অভাব প্রকট। নানাভাবে 'ব্যাকচেক' চালানো সত্ত্বেও মনের খটকা দূর করতে পারি নি। উত্তরদাতাদের শতকরা পঁয়ষট্টি ভাগই আঠেরো থেকে পঁয়ত্রিশের দলে ; এর প্রধান কারণ অন্যান্য বয়ঃগোষ্ঠীর সদস্যদের উত্তর দেবার অনিচ্ছে। শতকরা সত্তর ভাগই ব্যবসায়ে রয়েছেন ; বাকিরা চাকরিরত ও ছাত্রছাত্রী। ষাট ভাগ বিবাহিত ; সকলেই নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে। শতকরা আশি ভাগ উত্তরদাতা স্কুলের পড়াশেষ করে আর ওপরদিকে যান নি ; লেখাপড়ার মাধ্যম বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইংরেজি ও চিনা।

উত্তরদাতাদের চল্লিশ শতাংশের মাসিক আয় তিন থেকে চার হাজারের মধ্যে ; আরও ঊনষাট শতাংশ দুই থেকে তিন হাজার পর্যন্ত মাসে আয় করেন। মেয়েদের শতকরা ছেষট্টি ভাগ কর্মরতা।

পুরনো বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে মাতামাতি চিনাদের মধ্যে কম ; খ্রিস্টান ধর্মান্তরিতের সংখ্যা চোখে পড়ার মতো। তবে শুধু ইংরেজিঘেঁষা নাম ব্যবহার করছেন অথচ খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন নি, এমন উদাহরণও প্রচুর। উত্তরদাতাদের শতকরা ষাট ভাগ কোনও না কোনও ধর্মীয় সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আছেন।

সমীক্ষিত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের অর্ধেক ছিলেন ছত্রিশ থেকে উনষাটের মধ্যে ; আরও আটত্রিশ ভাগ ছিলেন আঠেরো থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। এঁরা প্রত্যেকেই ইংরেজিকেই মাতৃভাষা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

উত্তরদাতাদের অষ্টআশি ভাগ চাকরিরত ; বাকি বেকার বা ছাত্র। প্রায় তেষট্টি শতাংশ অবিবাহিত বা ডিভোর্সি। বিয়ে করে থাকলেও অধিকাংশই নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ে করেছেন ; তবে তাঁদের পরিবারের কেউ না কেউ অন্য সম্প্রদায়ে বিয়ে করেছেন তা সে এদেশেই হোক বা বিদেশে।

স্কুল পর্যায়ের পরে পড়াশুনো করেছেন মাত্র বাইশ শতাংশ যদিও সমীক্ষিত সকলেই সাক্ষর। ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে এই সম্প্রদায় সবচেয়ে পেছিয়ে আছে ; অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান উত্তরদাতাদের অর্ধেকেরই আয় মাসে দু'হাজারের কম। মেয়েদের মধ্যে কর্মনিযুক্তির অনুপাত অন্য সম্প্রদায়ের চেয়ে তুলনামূলকভবে বেশি ; শতকরা একচল্লিশ ভাগ মহিলা কোনও না কোনও অর্থনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত।

কলকাতার পার্সি সম্প্রদায় আয়তনে বোম্বাইয়ের পার্সি গোষ্ঠীর চেয়ে ছোট, শহরের অর্থনীতিতেও এঁদের গুরুত্ব কম। কলকাতার অন্যান্য ছোট সম্প্রদায়গুলোর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে এখানকার পার্সি গোষ্ঠী অনেক বেশি সুসংগঠিত ও দলবদ্ধ। এঁদের বেশির ভাগই ইরান থেকে বহুযুগ আগে ভারতের উত্তর পশ্চিম উপকূলে, বিশেষত, গুজরাতে, এসে পৌঁছেছিলেন। ফলে চুরাশি শতাংশই গুজরাতিকে মাতৃভাষা হিসেবে গণ্য করেন। মোট পার্সিদের আটষট্টি ভাগ চাকরিতে নিযুক্ত, একুশ ভাগ ব্যবসায়-বাণিজ্যে এবং এগারো শতাংশ ছাত্রছাত্রী, কর্মহীন বা অবসরপ্রাপ্ত।

চাকরিই হোক বা ব্যবসা—পার্সিদের আয় অন্য সম্প্রদায়ের তুলনায় বেশ উঁচুর দিকে। মোট পার্সিদের বেয়াল্লিশ ভাগ মাসে পাঁচ হাজারের ওপরে রোজগার করেন। আরও একুশ ভাগ আছেন তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজারের মধ্যে। তিপান্ন শতাংশ ক্ষেত্রেই বাড়ির পুরুষমানুষেরা রোজগেরে ; মেয়েরাও পেছিয়ে নেই। মেয়েদের মধ্যে শতকরা একচল্লিশ ভাগ নানাধরনের অর্থকরী কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত। উত্তরদাতাদের কেউই নিজের সম্প্রদায়ের বাইরে বিয়ে করেন নি, শতকরা চৌষট্টি ভাগ ছিলেন বিবাহিত।

পার্সি উত্তরদাতাদের মধ্যে সাঁইত্রিশ শতাংশ করে রয়েছেন গ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ; বাকি ছাব্বিশ শতাংশ স্কুল পাশ করেছেন। সুতরাং লেখাপড়ার মান বেশ উঁচুর দিকেই।

সাতচল্লিশ শতাংশ পার্সি নিয়মিত, এবং তিপান্ন শতাংশ মাঝে-মাঝে ধর্মীয় সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। উত্তরদাতাদের মাত্র বাইশ শতাংশ কলকাতা শহরে জন্মেছেন, যদিও বাকিদের মধ্যে আটষট্টি ভাগই জন্মস্থানের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখেন না।

নিজের এলাকা ও কলকাতা শহর সম্পর্কে এই পাঁচটি ছোট সম্প্রদায়ের সচেতনতা মাপার জন্য কয়েকটা মজার প্রশ্ন রেখেছিলাম এঁদের সামনে। জানতে চাইলাম উত্তরদাতার বাড়িতে যে লোকটি রোজ খবরকাগজ দিয়ে যায় তার নাম, পাড়ার যে কোনও একটি ছেলের নাম, তাঁর প্রতিবেশীর নাম, পাড়ার কোনও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির নাম। কলকাতায় তাঁর সম্প্রদায়ের নেতার নাম, এবং কলকাতার প্রতিষ্ঠাতার নাম।

ইহুদিদের মধ্যে নিজের পাড়া, নিজের সম্প্রদায় ও কলকাতা শহরের বিষয়ে সচেতনতা যথেষ্ট বেশি। মোট উত্তরদাতার শতকরা চৌষট্টি ভাগই কিন্তু তাঁদের ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত করপোরেশন-কাউন্সিলারের নাম বলতে পারেন নি। ভাবতে আশ্চর্য লাগে এককালে এই সম্প্রদায় কলকাতা শহরের সুষ্ঠু পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিতেন, কর্পোরেশনেও প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সদস্যসংখ্যা কমার সঙ্গে সঙ্গে যেন এ শহর পরিচালনার ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহও কমে গেছে। আর্মেনীয় উত্তরদাতারা প্রায় সকলেই নিজের সম্প্রদায়ের নেতার নাম জানেন অথচ সে তুলনায় মেয়রের নাম, এমনকি রোজকার খবরকাগজওয়ালার নাম জানার অনুপাত খুব কম। চিনাদের অধিকাংশ নিজেদের এলাকা, নিজের প্রতিবেশী বা সম্প্রদায়ের নেতার নাম জানেন কিন্তু কাউন্সিলারের নাম করতে পারলেন না। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদেরও অনুরূপ অবস্থা। একমাত্র পার্সিদের মধ্যে এ শহর সম্পর্কে সচেতনতার মাত্রা বেশ উঁচু। খবরকাগজ-পত্রিকায় কলকাতা বিষয়ে সাম্প্রতিক লেখালেখির একটা ভাল ফল হয়েছে ; কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে জোব চার্নকের নাম করলেন প্রায় প্রত্যেকেই।

এসব সম্প্রদায়ের সদস্যরা কলকাতার ও পারস্পরিক জীবনে কতখানি অংশ নেন তা বোঝার জন্য জানতে চেয়েছিলাম শহরের সাধারণ মিটিং-মিছিলে তাঁরা যোগ দেন কিনা, এবং তাঁরা কোনও রাজনৈতিক দলের সভ্য কি না। অন্যান্য সম্প্রদায়ের পূজা-পার্বণে যোগদানের অনুপাতই বা কেমন।

নিজের সম্প্রদায়ের এরকম বড় মিটিং হলে তাতে যোগ দেন পঁচাত্তর শতাংশ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, এবং ছাপ্পান্ন শতাংশ করে ইহুদি ও পার্সি উত্তরদাতা চিনারাও মোটামুটি (৪০%) যোগ দেন নিজেদের এলাকার সাধারণ মিটিং-এ।

ইহুদিরা নিজেদের পূজা-পার্বণে (ইয়ম কিপ্পার) উপস্থিত তো থাকেনই, তাঁদের মধ্যে তেইশ শতাংশ দুর্গাপুজো ও চৌত্রিশ শতাংশ বড়দিনে নিয়মিত অংশ নেন। কোনও বাঙালি পরিবারে বিবাহ-অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছেন উননব্বই শতাংশ ; কিন্তু আরও ঘনিষ্ঠ না হলে যেসব অনুষ্ঠানে যাওয়ার সুযোগ হয় না সেগুলিতে, অর্থাৎ জন্মদিন, অন্নপ্রাশন, নববর্ষ বা শ্রাদ্ধে উপস্থিত থাকার অভিজ্ঞতা হয়েছে মাত্র চৌত্রিশ ভাগের।

আর্মেনীয়রা আবার অন্যান্য সম্প্রদায়ের উৎসবে উপস্থিত থাকেন না যদিও তাঁদের পঁয়তাল্লিশ শতাংশ কোনও না কোনও বাঙালি বিয়েবাড়িতে এসেছেন। অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলিতে তাঁরা যাননি বলে জানালেন।

চিনাদের শতকরা ষাট ভাগ দুর্গাপুজা ও ঈদে মাঝে মাঝে যোগ দেন ; তবে বড়দিনে অংশ নেন শতকরা বিরাশি ভাগ। কিন্তু মাত্র কুড়ি শতাংশের কোনও বাঙালি বিয়েবাড়িতে উপস্থিত থাকার অভিজ্ঞতা হয়েছে।

নওরোজ ছাড়া পার্সিরা অংশ নেন দুর্গাপুজোয় (৪৭%) ও বড়দিনে (৫৮%) নিয়মিতভাবে। তবে ঈদ, গুরু নানকের জন্মদিন কিংবা ইয়ম কিপ্পারে তাঁরা প্রায় কখনই অংশ নেন না। পার্সিদের সকলেই কোনও না কোনও বাঙালি বিয়েবাড়িতে এসেছেন, বাঙালি পরিবারে জন্মদিনের অনুষ্ঠানেও যোগ দিয়েছেন শতকরা চৌষট্টি ভাগ। তবে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছেন শতকরা মাত্র বত্রিশ ভাগ।

দুর্গাপুজোয় নিয়মিতভাবে যোগ দেন মাত্র পঁচিশ শতাংশ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ; তবে মাঝে-মাঝে উপস্থিত থাকেন আটত্রিশ শতাংশ। এঁদের প্রত্যেকেই বড়দিন পালন করেন তবে ঈদ (১৩%) ছাড়া অন্য কোনও সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এঁরা উপস্থিত থাকেন না। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান উত্তরদাতাদের প্রত্যেকেই কোনওনা কোনও বাঙালি পরিবারে বিয়ের নেমন্তন্ন রেখেছেন ; প্রায় অর্ধেকজন্মদিন, অন্নপ্রাশন বা শ্রাদ্ধে উপস্থিত থেকেছেন। সমস্ত উত্তরদাতাদের অর্ধেকেরও বেশি একবাক্যে জানান বর্তমানে এধরনের আন্তঃসাম্প্রদায়িক মেলামেশার সুযোগ আগের চেয়ে বেড়ে গেছে। এতজনের মধ্যে একজনও কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য নন। আর শহরের রাজনৈতিক জনসভা বা মিছিলেও এঁরা কেউ-ই তেমন যোগ দেন না।

সবশেষে প্রশ্ন ওঠে সংখ্যাভারাক্রান্ত এই দীর্ঘ সমীক্ষার থেকে কী পেলাম?

আমার ধারণা হল নিজের সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রেখে চলা সত্ত্বেও এই সমীক্ষার উত্তরদাতা প্রায় সকলে শহরের বাকি জনসমূহের সঙ্গে মোটের ওপর খাপ খাইয়ে চলতে পারছেন। কর্মক্ষেত্রে তো বটেই, সামাজিক মেলামেশার জগতেও বেশ কিছুটা সামঞ্জস্যসাধন ঘটেছে। তবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আন্তঃসাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য লক্ষণীয়ভাবে কম। তবে আমার কথা এই যে, বেশির ভাগ উত্তরদাতাই মনে করে আগের চেয়ে মেলামেশার ক্ষেত্রগুলো চওড়া হচ্ছে ; ভবিষ্যতের পক্ষে এটা আশার ইঙ্গিত বয়ে আনছে।

কলকাতা সম্পর্কে অনুভূতি ও সচেতনতা নির্ভর করেছে প্রতিটি সম্প্রদায়ের সামগ্রিক ইতিহাস ও উত্তরদাতার নিজস্ব অর্থনৈতিক সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের ওপর।

কলকাতা শহরের জনজীবনের নানা বিষয় নিয়ে আপনার-আমার মতো এঁরাও কখনও কখনও অসন্তুষ্ট, তবে সেই বিরক্তির সঙ্গে একটা বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার কোনও সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। খুব সম্ভবত অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে কলকাতা সম্পর্কে অনুভূতির সরাসরি সম্পর্ক বেশি। একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মাত্রেই সমুদ্রপারের 'হোমে'র দিকে চেয়ে রয়েছে সতৃষ্ণ নয়নে—এই চিরাচরিত ভাবনাকে সমর্থন করার মতো কোনও তথ্য এই সমীক্ষায় পাইনি। আমার ধারণা, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ও অবনতির সঙ্গে কলকাতার বিষয়ে সন্তোষ বা অসন্তোষ ব্যক্ত হওয়ার লক্ষণ বেশি, এবং তা যে কোনও সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে সমানভাবে সত্য হবে।

সাম্প্রদায়িক ইতিহাস বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গুরুত্বকে কিন্তু সম্পূর্ণ অস্বীকার করে লাভ নেই। তবুও সর্বদা মনে রাখতে হবে, শহর কলকাতার বাসিন্দারা অর্থনৈতিক বিচারে নানা ধাপে রয়েছেন, এবং আমাদের সমীক্ষিত মানুষেরা সেই বিপুল জনগোষ্ঠীর একটা ক্ষুদ্র অংশ হলেও এই বিভেদের মূল বিষয়গুলো এঁদের সম্প্রদায়েও লক্ষ করার মতো। তাই কলকাতা বিষয়ে এসব ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের অনুভূতিগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিশেষ বিশেষ অর্থনৈতিক শ্রেণীর মতামতের প্রতিফলন, যদিও সম্প্রদায়গত ইতিহাসকে সবসময়ে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা চলে না।

কুন্তলা লাহিড়ী দত্ত